ছুরিকাঘাত

শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের গল্প

জগুদার হাতের লম্বা ছুরিটার সঠিক বর্ণনা আমি আর দিতে পারব না। ফলাটা নিশ্চয়ই ছ ইঞ্চির একটু ওপরেই ছিল, কিন্তু সেটা তার বিশেষত্ব ছিল না। শহরের সব মস্তানই যখন তাদের চাকুর ব্লেডগুলোকে দু-আঙুলে টিপে ঘ্যাড়ঘ্যাড়, খ্যাড়খ্যাড় করে টেনে বার করত খাপ থেকে, জগুদা তখনই ঝটকা মেরে ছুরিটা তুলে আনত কোমর থেকে। আর তারপর তার চিতাবাঘের মতন চোখ যখন দপদপ করে জ্বলতে থাকত, আতঙ্কের সম্মোহন বিস্তার করত প্রতিদ্বন্দ্বী মস্তানের ওপর, ততক্ষণে তার ডান হাতের তালুর মধ্যে ক্লিক করে ধাতব শব্দ উঠত। আর অমনি অটোম্যাটিক্যালি, ছ-ইঞ্চিরও বাড়তি দৈর্ঘ্যের ফলাটা কড়াৎ করে বেরিয়ে আসত খাপ থেকে। ছুরির এই স্বয়ংক্রিয় ঔদ্ধত্য সে-সময় বহু মস্তানের হৃৎপিন্ডে দারুণ ধাক্কা দিত ভয়ের। আমরা বহু মস্তানকে সে-সময় হতবুদ্ধি থাকতে দেখেছি শুধুমাত্র এই ছুরির ফলাটার দিকে।

তবে জগুদা কখনো ওই ছুড়ির ভড়কির সুযোগে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীকে আঘাত করেনি। কারণ জগুদার আস্থা ছুরির চেয়েও বেশি ওর নিজের দেহের শক্তি ও কবজির কায়দার ওপর। তা ছাড়া পূর্বের দিনের মস্তানদের মতন জগুদার

ভেতরও অনেকখানি ন্যায়পরায়ণতা ও আত্মম্ভরিতা কাজ করত। একবার চাকু খুললে প্রতিপক্ষের কিছুটা রক্তপাত না ঘটিয়ে সে ছাড়ত না। অথচ পরাস্ত প্রতিপক্ষকে প্রাণে মারারও ঘোর বিরোধী ছিল জগুদা। বহুদিন মস্তানির সুযোগ না পেলে জগুদা দুপুরে স্নানের আগে গায়ে তেল মেখে হাতে ছুরি নিয়ে শ্যাডো-ফাইটিং করত। আমরা পাড়ার বালকরা, বহুবার জগুদার কাছে, ওর ছুরিটা দেখার বাসনা ব্যক্ত করেছিলাম। কিন্তু ওই একটা ব্যাপারেই জগুদার স্বভাবত স্নেহশীল প্রাণটাকে টলানো যায়নি।

আমরা জগুদার ছুরিটা হাতে নিয়ে কখনো দেখিনি, কিন্তু দূর থেকে অনেকবার দেখেছি, এমনকী ইন অ্যাকশান। কারণ পাড়ায় তখন মাসে, দু-মাসে একটা না একটা মস্তানির ঘটনা ঘটতই। দলবদ্ধভাবে কোনো অভিযানে গেলে জগুদা রিভলবার, সোর্ড, লাঠি নিয়ে বেরোত। আশপাশের বহু পাড়াকে জগুদা এমনভাবে ঠাণ্ডা করে রেখেছিল। কিন্তু অন্য কোনো উঠতি বা ডাকসাইটে মস্তানের সঙ্গে জগুদা মুখোমুখি ডুয়েল পছন্দ করত। এবং এভাবে বহু মস্তানকে রাস্তায় পেড়ে ফেলে তার টুটি টিপে জগুদা তাকে ক্ষমা চাওয়া ও নতি স্বীকার করিয়েছে। ছুটির দিন দশটা এগারোটা নাগাদ, কিংবা এমনি দিনে পড়ন্ত দুপুরে এইসব লড়াই জমত পাড়ায়। তখন পাড়ায় মান্যগণ্য ব্যক্তিরা পুলিশে ফোন করার বদলে বারান্দায় ঝুঁকে এই গ্ল্যাডিয়েটরীয় যুদ্ধ দেখায় মেতে উঠতেন।

বলা বাহুল্য, জগুদা আমাদের হিরো ছিল। এবং জগুদা কখনো কোনো ব্যক্তিগত, সম্মুখ সমরে হারেনি, বা পেছপা হয়নি। ছুরি ছাড়াও জগুদা বহুবার খালিহাতে লড়েছে। এবং তেমন ক্ষেত্রেও রক্তপাত কিছু কম ঘটেনি।

ছেলেবেলা থেকেই রক্ত দেখলে আমার মাথা ঘোরে, শরীর কাঁপে। কিন্তু মন ও শরীরে কোনো বিপত্তিই আমাকে জগুদার লড়াই দেখা থেকে নিবৃত্ত করতে

পারেনি। প্রথম প্রথম যে মাথা ঘোরেনি তা নয়। কিন্তু ক্রমে ব্যাপারটা গা সওয়া হয়ে গেল। এবং আরও কিছুদিন যেতে সেটা নেশায় দাঁড়িয়ে গেল। যে আমি ইশকুলের মিসট্রেসের আঙুল বেয়ে রক্ত গড়াতে দেখলে প্রায় ভিরমি খেতাম সেই আমিই তখন অপার আহ্লাদে পাড়ার মস্তানি দেখছি। সে আহ্লাদ কিছুটা যেন টারজেনের ছবি দেখার মতন। লড়াই দেখার মুহূর্তে আমি নিজেও তখন মনে মনে জগুদা। জগুদার ছোড়া প্রত্যেকটা ঘুষি কিংবা চাকুর চালের সঙ্গে কিছুটা মিশে যাচ্ছে আমার নিজের শক্তি ও কল্পনা। জগুদার শরীর লক্ষ করে নিক্ষিপ্ত তার প্রতিপক্ষের কিছু কিছু আঘাতও যেন আমার গায়ে এসে পড়ছে।

একেক দিন আমরা সকাল থেকেই খবর পেয়ে যেতাম অমুক পাড়ার তমুককে পাড়ায় এনে পিটবে জগুদা। সেদিনটা তৎক্ষণাৎ পাড়ার ছেলেছোকরাদের কাছে উৎসবের দিন হয়ে যেত। আমরা আকাশের সূর্যের দিকে তাকিয়ে গভীর প্রত্যাশায় থাকতাম কখন দিনমণি পশ্চিমে কিছুটা হেলে পড়ে যুদ্ধের সময় আগিয়ে আনবেন। আমরা নিজেদের মধ্যে জল্পনাতেও ব্যস্ত হতাম মল্লবীর দারা সিং-এর সঙ্গে আখড়ায় নামলে জগুদা বিজয়ী হবে কি হবে না। কিন্তু জগুদার পকেটের স্বয়ংক্রিয় ছুরিটির কথা ভাবলে আমরা নিজেরাও মনে মনে শিউরে উঠতাম। জগুদার খোলা ছুরির সামনে আমরা নিরস্ত্র দারা সিংকেও ছেড়ে দিতে রাজি ছিলাম না।

সেদিনও এমনি একটা শীতের সকাল। হয়তো ছুটির দিন। আমরা খবর পেলাম জগুদাকে ফাইটে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে বেপাড়ার উঠতি মস্তান কেলে বিশে। কেলে বিশে আমরা শুনেছিলাম রোগা, লম্বা ও বিদ্যুৎগতিসম্পন্ন। তাকে মুঠোয় আনা কোনো মানুষের কম্ম নয়। তার হাতে ছুরিও খেলে বিদ্যুতের মতন। এতাবৎ সে অনেক মস্তান ও পুলিশ অফিসারের দেহে তার হাতের সূক্ষ্ম কাজের প্রমাণ রেখেছে। কিছু নরহত্যার দাবিও সে করে থাকে।

সে এখন জগু সিংহকে তার পয়লা নম্বর শত্রু মনে করে। তাই ছুরি মোলাকাতে আসবে।

আমাদের পাড়ার সবারই রক্তের গতি সেদিন ভয়ানক দ্রুত হয়ে গেছিল। আমাদের মধ্যে অনেকে এ মতও পোষাণ করতে শুরু করেছিল যে জগুদা হয়তো শেষমেশ কেলে বিশেকে বাগে আনতে পারবে না। হয়তো আহত হবে, নচেৎ আসর ছেড়ে সরে দাঁড়াবে। একমাত্র নির্বিকার ছিলাম আমরা। যাদের কাছে জগুদা চাকু হাতে টারজেন, চাবুক হাতে জোরো কিংবা অন্য কোনো কমিক স্ট্রিপের হিরো। জগুদা হারছে, এমন কথা আমাদের কোনো গল্পের বই বা কমিকসে লেখা নেই।

আমি শুধু উৎকন্ঠার সঙ্গে নজর করছিলাম আকাশের সূর্যটাকে। কখন সেটা রঞ্জুদের বাড়ির পিছনে হেলে পড়বে। আমি ধৈর্যহীনতার বশে একবার রাস্তায় গিয়ে উঁকি দিয়েছিলাম এবং তার বাড়ির সামনে পায়চারিরত জগুদার কোমরে ছুরিটা দেখে নিশ্চিন্তও হয়েছিলাম। চার্চিলের মতন দুটো আঙুল দিয়ে বিজয় চিহ্ন 'ভি' এঁকে দেখিয়েও ছিলাম জগুদাকে। জগুদা সে-দৃশ্য দেখেছিল কি না মনে নেই। তবে জগুদাকেও সেদিন অযথা উত্তেজিত বলে মনে হয়নি। সে শুধু হাওয়ার মধ্যে বোলারদের মতন তার দুটি হাত লম্বা করে সামনে পিছনে ঘোরাচ্ছিল। যেন এইমাত্র ভিনু মাঁকড়কে একটা ইন-সুইংগার নিক্ষেপ করবে। কিন্তু আসলে, জগুদা ওর হাতটাকে একটু ব্যায়াম করাচ্ছিল।

কখনো কখনো ওর ঝাঁকড়া কেশরাশি ঝাঁকিয়ে নিচ্ছিল জগুদা। আর অদূরে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য এক নাগাড়ে চোখ দিয়ে পান করছিল জনা ত্রিশেক ছেলেছোকরা। এপাড়ার ও আশেপাশের এলাকার উঠতি মস্তানরা।

শীতের দিন বলে সূর্যদেব আমাদের বেশিক্ষণ প্রতীক্ষায় রাখেননি। তাড়াতাড়ি হেলে পড়লেন রঞ্জুদের বাড়ির পিছনে। রোমানদের আমল হলে একটা ভেরি বেজে ওঠার প্রয়োজন হত। সেদিন সেই কাজটা করল ছনাদা। একটা ফুটবলের বাঁশি জোগাড় করে বার কয়েক বাজিয়ে দিল। ইতিমধ্যে শতখানেকেরও বেশি লোক জমে গেছে আমাদের বাড়ির সামনে। আমার উকিল বাবা পাড়ার এই নিয়মিত এন্টারটেনমেন্টের ব্যাপারে ছিলেন একেবারেই অনভিজ্ঞ। বাড়ির সামনে অত ভিড় দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে অত ভিড় কীসের? কিন্তু সত্যি কথাটা বলার সাহস আমার কোনো মতে জোগাল না। পাছে আমায় নিষেধ করেন রক্তারক্তি ব্যাপার দেখায়। আরও মুশকিলের হবে বাবা যদি রাস্তায় গিয়ে জগুদাকে লড়াই করতে বারণ করেন। জগুদা বাবার খুব অনুগত, মামলায় জড়ালেই বাবার কাছে পরামর্শ নেয়। বাবা বললে জগুদা কিছুতেই লড়বে না।

অথচ জগুদা না লড়লে গোটা পাড়ার সম্মান ধুলোয় মিশে যাবে। অগত্যা বাবাকে বললাম, বাবা, আজ এখানে ভাল্লুক খেলা হবে। বাবা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ভাল্লুক খেলা?

বাবা তখন বিরক্তির মুখ করে বললেন, দিন দিন পাড়ার বাড়ি লোকগুলো সব গাধা হয়ে যাচ্ছে। ধুত্তোর! এই বলে বাবা খড়মের খটখটাশ আওয়াজ করে নিজের সেরেস্তায় চলে গেলেন! আর ঠিক তখনই রণাঙ্গনে উপস্থিত হল উঠিত রংবাজ কেলে বিশে।

আমি গুটি গুটি বাড়ির গ্যারেজের ছাদে গিয়ে বসলাম। আর এক লহমা কেলে বিশেকে দেখে আমার রক্ত হিম হওয়ার জোগাড় হল। প্রায় ছ-ফুট লম্বা কালো জল্লাদের চেহারা তার। একরাশ কোঁকড়া চুল। ঠোঁট দুটো পান খেয়ে রক্তের মতন লাল। চোখ দুটো অন্ধকারে বেড়ালের চোখের মতন। ওরকম দড়

পাকানো শরীরে হালকা সিল্কের সাদা সার্ট। কালো প্যান্টটা ওর এতই আঁটো সাঁটো যাতে মনে হয় ওকে পরিয়েই সেটার সেলাইকর্ম করা হয়েছে। কোমরের বেল্টটা চওড়া, তাতে কয়েকটা লোহার বল্টু আঁটা আছে। আর ওর পা চাপা, কোমর ঠাসা প্যান্টের হিপ পকেট থেকে বেরিয়ে আছে ওর চাকুর বাঁট। ও একটা হুংকার ছেড়ে চার পাঁচজন দর্শককে গোঁত্তা মেরে ঢুকে পড়ল লড়াইয়ের আখড়ায়। সেখানে ততক্ষণে খালি গায়ে তার ট্রাউজারে উদাস নেত্রে দাঁড়িয়েছিল জগুদা।

বিশে সড়াক করে ওর চাকু বের করল। তারপর ছুরির ভোঁতা দিকটা দিয়ে কপালের কিছুটা ঘাম আঁচড়ে স্বেদবিন্দুগুলো ছিটকে দিল দর্শকদের গায়ে আর মুখে বলল, জগু, আজ তুমি থাকবে আর না হয় আমি।

এবার জগুদার তৈরি হওয়ার পালা। জগুদা ওর উদাস দৃষ্টিকে ক্ষণিকের মধ্যে চিতা বাঘের মতন হিংস্র করে বলল, কালকা যোগী, আগে বাঁট সিধে করে ধর। বিশে ওর বাঁটের দিকে তাকাতে জগুদা নিমেষের মধ্যে কোমর থেকে বার করে ফেলল ওর ছুরিটা। কিন্তু সেটাকে না খুলেই তেড়ে গেল বিশের দিকে। বিশে জগুদার মুখ লক্ষ করে চাকু চালাল, কিন্তু জগুদা বসে গিয়ে আঘাত এড়াল। বিশে ফের নিজেকে সোজা করার আগে জগুদা ওর বিশাল বাঁ হাতটা দিয়ে ওর চুলের মুঠি ধরে ওকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল ফুটপাথের দিকে। কিন্তু, তখনও জগুদা ওর চাকু খোলেনি। উলটে উপস্থিত সবাইকে অবাক করে জগুদা ওর চাকুটা ফের গুঁজে নিল কোমরে। আর ভারমুক্ত ডান হাত দিয়ে বিশের চোয়ালে একটা ঘুষি মারল। বিশে ছিটকে পড়ল সানের ওপর। আর তখনই ওর গলার ওপর হাঁটু টিপে বসে পড়ল জগুদা।

যতদূর মনে পড়ে সেসময় বিশের গলা দিয়ে কান্নার মতন একটা ধ্বনি নিঃসৃত হয়েছিল। কেন? কেননা ওর গলার ওপর হাঁটু গেড়ে বসার পর জগুদা আস্তে আস্তে ওর প্রিয় ছুরিটা বার করে 'ক্লিক' ধ্বনি সৃষ্টি করে ছুরির ব্লেডটাকে পড়ন্ত রোদের আভায় লাল করে তুলেছিল। বিশে বুঝেছিল ওই ছুরি রক্ত পান না করে খাপে ফিরে যাবে না।

'জগুদা, বাঁচাও। বলে একটা ডাকও ছেড়েছিল বিশে। সেই মুহূর্তে জগুদার মুখ-চোখ দেখে মনে হচ্ছিল কেলে বিশেকে খুন করতে চায় সে। কিন্তু আত্মসমর্পণ করার পরেও জগুদা কাউকে মেরেছে বলে শুনিনি। কিন্তু সেদিন যেন নিয়মভঙ্গ হতে চলেছিল। জগুদা তার ছুরিটাকে মুড়ে ফেলল না। কিন্তু বুকে স্ট্যাব না করে হালকা ভাবে বিশের গলা থেকে নাভি অবধি ক্ষত এঁকে দিল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে টান-টান হয়ে পড়ে থাকা কেলে বিশের মুখের উপর থুতু দিয়ে বলল, শুয়ারের বাচ্চা চাকু খোলা অব্দি টিকতে পারলি না শালা মস্তান।

জগুজা রণাঙ্গন ত্যাগ করার পরও বহুক্ষণ রাস্তায় শুয়েছিল কেলে বিশে। আস্তে আস্তে ওর সাদা শার্ট ভেদ করে ফুটে উঠল একটা দীর্ঘ রক্তের রেখা। সে-রেখা ক্রমশ জেবড়ে যেতে থাকল গোটা বুকে ছড়িয়ে গিয়ে। তারপর একসময় ওর জনা চারেক সাঙ্গপাঙ্গ যখন ওর ক্লান্ত, বিধ্বস্ত শরীরটা কাঁধে চাপিয়ে হাসপাতালের দিকে রওনা হল তখন সূর্য অস্তাচলে। পাড়ার ছেলেদের মধ্যে ব্যাপক জয়োল্লাস, যেন আমাদের ফুটবল টিম শিল্ড জিতে এসেছে। কিন্তু আমার নজর তখনও আটকে আছে কেলে বিশে যেখানে শুয়েছিল তার সামান্য দূরে রাস্তার ড্রেনের ঝাঁঝরিটার দিকে। সেখানে তখনও খোলা অবস্থায় পড়েছিল জগুদার রক্তমাখা ছুরিটা। বিশেকে ক্ষতবিক্ষত করে সেটিকে তাচ্ছিল্যের হাসির সঙ্গে জাগুদা ছুড়ে দিয়েছিল নর্দমার দিকে। যাতে

মনে হয় জগুদা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল বিশের প্রাণ না নিলে ওই ছুরি সে বাড়ি নিয়ে ফিরবে না।

আশ্চর্য, কেউ কিন্তু সেটা যথেষ্ট নজর করেনি। তাই লড়াই শেষ হতে সবাই হই হই-তে মাতল, কেউ ওই সাধের ছুরিটা একবার তুলে নিয়ে পরখ করল না। আমি বুঝেছিলাম আমার এটাই একমাত্র সুযোগ ছুরিটাকে অন্তত স্মৃতি হিসেবে হস্তগত করার। তাই সবাই যখন তখনও সদ্য সমাপ্ত যুদ্ধের উন্মাদনা ও বিশ্লেষণে মত্ত আমি চুপচাপ গ্যারেজের ছাদ থেকে নেমে গেলাম রাস্তায়। আর ড্রেনের কাছে উবু হয়ে পেচ্ছাব করার ভণিতা করে কুড়িয়ে নিলাম ঐতিহাসিক চাকুটা। তারপর নিঃশব্দে বাড়ি ফিরে সেটিকে ধুয়ে ফেলে বিশের রক্তমুক্ত করে ছাদের চিলেকোঠায় পায়রার বাসার পিছনে খড় চাপা দিয়ে এলাম। এসব বহু আগের কথা। তারপর বহু জল গড়িয়েছে গঙ্গা দিয়ে। আরও ঢের রক্তপাত ঘটে গেছে আমাদের পাড়ায়। মস্তানির উত্থান-পতন ঘটেছে, রাজনীতির রং ও ঢং বদলেছে, জগুদার গৌরবের দিন অস্তমিত হয়েছে বহুকাল। আরও বহু মস্তান জেগেছে, কিন্তু তারা কেউ জগুদার ছিটেফোঁটা মর্যাদাও পায়নি। বহুদিন হল বাবা পরলোকগমন করেছেন এবং ওই পাড়ার বাড়ি বিক্রি করে আমরা অন্য পাড়ায় চলে এসেছি। বাবার বহু শখ ছিল আমি বিলেতে যাব, ব্যারিস্টার হব, কিন্তু আমি ভীত হয়েছি। বাবা অনেক কিছুই চাইতেন, কিন্তু আমি কোনো কিছুই হইনি। আমার ওপর রাগ করলে বাবা বলতেন, শেষকালে তোকে জগুর দলেই ভরতি হতে হবে। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি টের পেয়েছি যে, আমার সেইটে হওয়ার কোনো যোগ্যতা নেই। আমি যথাকালে দর্শনের অধ্যাপক হয়ে কলকাতার উপকণ্ঠে এক কলেজে যোগ দিলাম। আমার একটিমাত্র সুনাম সমাজে রটেছিল—আমি অত্যন্ত ভদ্রলোক। বাড়ির চাকর রাখলে প্রথমে দু-দশদিন ‘আপনি’ করে কথা বলি। পাশের ঘর থেকেও কেউ কোনোদিন আমার কণ্ঠ শুনতে পাবে না। এমনকী কলেজেও ক্লাস নিলে পিছনে বসা ছাত্রছাত্রীরা আমার গলা শুনতে

পায় না। তারা তখন নিজেদের গল্পগুজবে মন দেয়। তাদের চেঁচিয়ে বারণ করা মতন কন্ঠশক্তিও আমার নেই।

এবং এরকম পরিস্থিতিতে একজন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক কী করেন? তিনি তাঁর যাবতীয় লাঞ্ছনা ও অমর্যাদার প্রতিশোধ নিতে গল্প, উপন্যাস লেখায় ব্রতী হন। এবং আমিও তাই হলাম। তেমন আহামরি সাহিত্য রচনার ক্ষমতা আমার নেই, তাই নিজের পক্ষে যতখানি জটিল করে কিছু লেখা যায় আমি সেই চেষ্টাই করলাম। কিছু সম্পাদকের ধারণা হল আমি একেবারে প্রথম শ্রেণির জিনিয়াস। কারণ আমি লিখতাম মানুষের জটিল মনস্তত্ব নিয়ে, যার সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান আছে কি না আমারও সন্দেহ, সমাজের নীচুতলার মানুষের হাহাকার নিয়ে (এই দ্বিতীয় ব্যাপারটি ছিল ওই জাতের ওপর আমার সবচেয়ে বড়ো ধোঁকাবাজি)। যা জানি না তাই লিখতাম বলে আমার স্পর্ধারও অন্ত ছিল না। শেষে একদিন আমার গুণমুগ্ধ এক সম্পাদক এসে বললেন, রাজীববাবু দলিত সমাজের ওপর আপনার লেখাগুলো এত চমৎকার হয়, তাই একটা অনুরোধ জানাতে এলাম। আপনি কলকাতার গুণ্ডা-মস্তানদের নিয়ে একটা উপন্যাস আমাকে দিন। যত সময় লাগে নিন, কিন্তু দিন।

এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না, সেদিন আমার শিরদাঁড়া দিয়ে হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে লাগল। মানছি, আমি গরিব মানুষের সমাজ নিয়ে কিছুই জানি না। মানছি আমি বানিয়ে লিখি, এবং তেমন ভালো বানাতেও পারি না। এ দেশে এই ভাষায় এইসব ফালতু লেখা চলে। কিন্তু মস্তানি! আমি তো মস্তানদের দেখেছি। তাদের জগৎ তো আমার চেনা। এখন না হয় বহুদিন আমি ওদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি। তা হলেও ওদের নাড়িনক্ষত্র সবই তো আমার নখদর্পণে। আমি সত্যি তো ওদের চিনতাম! আমি ওদের নিয়ে বানাব

কী করে? ভালো করে কিছু জানলে তাই কি লেখা যায়? অন্তত আমি কি লিখতে পারি?

সম্পাদক মহাশয় চলে গেলে আমি আমার পুরোনো বইয়ের আলমারির একটা খাঁজ থেকে জগুদার ছুরিটা বার করলাম। কালে কালে এর সমস্ত বিশেষত্ব চলে গেছে। এখন বোতাম টিপে এই ছুরি খুললে একটা ছ-বছরের শিশুও অবাক হবে না। বড়ো কথা এটাকে টিপলেও হয়তো ফলাটা বেরুবে না, কারণ ব্লেডের আশপাশে মরচে ধরেছে। আমি ছুরিটা নিয়ে তেল দিয়ে রগড়ে এর চেহারা ও স্বভাব ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলাম। সামান্য চেষ্টাতেই ছুরির তেজ ফিরল, কিন্তু তার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব ধরা দিল না, যাতে কিনা কাউকে ডেকে বলা যায়—দ্যাখ, জগু মস্তানের ছুরি! কিংবা এই কথাটুকুও কেউ মেনে নিলে তাকে বলা যায়, এতে ঢের ঢের মস্তানের রক্ত লেগেছে! এত দিন পরে বার করে বুঝলাম যে, আমার নিজের কাছেও এই চাকুর রহস্য হারিয়ে গেছে।

কিন্তু আমি ছুরিটাকে ফের আলমারিতে চালান দিলাম না। আমি কলেজ যাওয়ার সময় সেটিকে পকেটে নিয়ে বেরুলাম। এবং সেদিনই জীবনে প্রথম ক্লাসের দু-চারটে বেয়াড়া ছেলেকে গলা ছেড়ে বকুনি দেওয়ার নতুন সাহস সঞ্চয় করতে পারলাম। দেখলাম তাতে আমার অনুরক্ত ছাত্র-ছাত্রীরাও রীতিমতন মুগ্ধ বোধ করল। কলেজ শেষ করে আমি বাড়ি ফিরলাম না। এক কুখ্যাত মদের আড্ডায় দু-পাত্র মদ পান করতে গেলাম। সমাজে আমার অনেক ভদ্রলোক হিসেবে সুখ্যাতি হলেও এইসব জায়গা যে আমার কাছে পুরোপুরি অচেনা ছিল তা কিন্তু নয়। কলকাতা আসলে খুব বড়ো শহর। একপ্রান্তের এলাকায় চরিত্র স্খলন হলেও অন্য প্রান্তের বাসিন্দাদের কাছে তা খুবই অটুট রাখা যায়। আমি বহুবারই অবাক হয়ে ভেবেছি যে, শুড়িখানার বহু তাৎক্ষণিক বন্ধুদের দিনমানে আর অন্য কোথাও কখোনো দেখিনি কেন?

নাকি আমি চোখে কম দেখি বা দেখেও চিনতে পারি না? আমার বরাবরই ভয় ছিল যে, মাঝেমধ্যে আমি যেসব পল্লিতে যাই সেই খবরও আমার কলেজে পৌঁছে যাবে। ছাত্র-ছাত্রীদের গার্জেনদের কানে উঠবে। তাও ওঠেনি। অর্থাৎ আমার দিনের এবং রাতের জীবনের মধ্যে দিন ও রাতের মতনই একটা দুস্তর ব্যবধান থেকে গেছে।

আর আজ আমি মস্তান অধ্যুষিত এই মদের আখড়ায় এলাম কারণ আমাকে মস্তানদের নিয়ে গবেষণা করতে হবে, কিছু লিখতে হবে। আমি রাজীব মিত্র, জগুদার পাড়ার মানুষ, জগু সিংহের একনিষ্ঠ ভক্ত। আজ মস্তানদের ব্যাপারে খোঁজ নিতে এলাম। কারণ মস্তান বিষয়ে যা আমি জানি তা জীবনেও লিখে দাঁড় করাতে পারব না। সত্য কথা দিয়ে সাহিত্য করার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই আমার। অতঃপর না জানি সে সবকে ভোলার জন্যই নতুন করে কিছু শিখতে হবে।

আমি একটা বাংলা পাঁইট টেবিলে রেখে কিছু ছোলা আর লেবুর রসের ফোঁটা মেলাচ্ছিলাম। যা আমার কখনো হয় না আজ আমার তাই হল। এক গেলাস গেলার আগেই নেশা নেশা ভাব হল। আমি ইতিউতি তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম আজকাল কারা মস্তান, তাদের চেহারা আর চরিত্র কেমন। তারা কী ভাষা বলে। কিন্তু যতই দেখছিলাম একটা ক্লান্তি ও হতাশা আমার মনের মধ্যে ছেয়ে যাচ্ছিল। আমি বুঝছিলাম যে, এইসব কালকা যোগীদের নিয়ে উপন্যাস লেখা আমার দ্বারা হবে না। কারণ আমি সত্যিকারের মস্তান চোখে দেখেছি। তাদের চিনেছি, আর ভালোবেসেছি। জীবনে এই প্রথমবার হয়তো আমাকে সম্পূর্ণ বাস্তব থেকে সংগ্রহ করে একটা উপন্যাস লিখতে হবে এবং এইবারেই প্রথম সব সম্পাদকরা এককাট্টা হয়ে ঘোষণা করবেন, এ কিছু হয়নি। এ অতিবাস্তব অতিনাটকীয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাকে ওই সত্যগুলোই লিখতে হবে। শুধু আমার লেখার জন্য ওই স্মৃতি ও সত্যগুলো আছে।

আমার পাঁইট শেষ হয়ে এসেছিল। আর একটা আনব বলে উঠতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ওঠার আর দরকার হল না, তার আগেই শুড়িখানায় ধুন্ধুমার কান্ড। গত রাত্রের এক ঝামেলার বদলা নিতে বেপাড়ার মস্তানরা রেড করেছে। এই আড্ডায় একেকজন মস্তানকে একেক করে তুলছে আর পিটছে। আমার চারপাশে বসে থাকা মস্তানগুলো দুদ্দাড় করে পালাবার চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু গেটের মুখেই ধরা পড়ে পিটুনি খাচ্ছে। রডের বাড়ি, চেনের চাবকানি খাচ্ছে। দোকানদার ঝাঁপ বন্ধ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। হঠাৎ একটা জোরালো কন্ঠস্বর ভেসে এল বাইরে থেকে। ভদ্রলোক যাঁরা আছেন আপনারা বেরিয়ে আসুন। কারো গায়ে হাত তোলা হবে না। অপনারা দেরি করবেন না। আমরাও ভদ্রলোক।

এই আওয়াজে অবশিষ্ট সমস্ত খদ্দেরই প্রায় ভদ্রলোক সেজে বেরুতে লাগল। আমি তাদেরই একজনের গোটা পাঁইট হাতিয়ে একদৃষ্টে টেবিলের দিকে তাকিয়ে চুক চুক করে মদ খেতে থাকলাম। আমি সমস্ত জোর দিয়ে মনকে বোঝালাম, আমি ভদ্রলোক নই। এক সময়ে পকেট থেকে জগুদার ছুরিটা বার করলাম, ওটার মান বজায় রাখতে হবে। কারণ শুড়িখানার বাইরে থেকে যে হুংকার এইমাত্র শুনেছি, সেটা আমার স্মৃতি বলছে কেলে বিশের ডাক।

আমি একা বসে আছি, বাইরে লঙ্কাকান্ড চলছে। কেলে বিশে শোর তুলেছে এই ভাটিখানা লন্ডভন্ড করবে। দোকানের মালিক এক কোণে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে। তাদের দিকে আমি তাকাইনি। কিন্তু ওদের দাঁতে দাঁত ঘষার শব্দ আমি পাচ্ছি। আমাকে হয়তো ওরা পাগল কিংবা মৃত বলে ঠাউরে নিয়েছে।

কেলে বিশের এক অনুচর ভেতরে উঁকি মেরে ঘোষণা করল, বিশেদা, ঠেক ফাঁকা। শুধু এক শালা ভদ্দরলোক বসে মাল টানছে। বিশে বলল, বার করে

দে ওকে। তারপর কী ভেবেই বলল, তুই থাক, আমি যাচ্ছি। তোরা শালা ভদ্রলোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে জানিস না।

আমার কাঁধে একটা মৃদু টোকা পড়েছে। একটা ভদ্র আহ্বান, দাদা বাড়ি যান। কিন্তু এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়িয়েছি। আমার শরীর আর মাথা রাগে কাঁপছে। আমার সামনে বাল্যের দেখা সেই বিশে মস্তান। ছ-ফুটেরও বেশি লম্বা! কিন্তু সেই কালো ঝাঁকড়া চুল আর নেই। সেখানে মস্ত টাক আর টাকের চারপাশে গোল হয়ে সাদা কোঁকড়া চুলের অপসৃয়মান রেখা। বিশের মুখে বুকে কাটা-ছেড়া দাগ। খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর গোঁফ। চোখের সেই চাহনি আর নেই। ছিপেছিপে শরীর মোটা কদাকার, চর্বির ঢিপি। আর নোংরা জালি গেঞ্জির নীচে ঢলঢলে ট্রাউজারটাও বিবর্ণ। কিন্তু আমি যা দেখতে চেয়েছিলাম সেটা বলা চলে অক্ষতই আছে অর্থাৎ জগুদার ছুরি দিয়ে গলা থেকে নাভি অব্দি এঁকে দেওয়া ক্ষত।

আমি জগুদার মতন হিংস্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছি বিশের চোখ লক্ষ করে। ঠিক জগুদার মতন অবলীলায় 'ক্লিক' ধ্বনি করে তার ছুরিটা খুলে ফেলেছি। আর বলছি, বিশে তোমার মনে পড়ে এই ছুরি? নাহলে নিজের বুকের দাগটা একবার দেখে নাও। কোন সাহসে তুমি শালা আমাকে ভদ্দরলোক ভেবে টিটকিরি দাও। রুস্তমি দেখাতে চাও তো বার করো চাকু!

জগুদার মুঠিতে যেমন, এখন চাকুটা সেইরকম রাগী হয়ে উঠেছে। ও কিছু রক্তপান করবেই। ও যেন আপনা থেকেই কেলে বিশের দিকে এগোচ্ছে। আমি শুধু ওকে ধরে আছি। আমি হাত ঘুরিয়ে দিকপরিবর্তনও করতে পারছি না। আমি মুঠো খুললেও বুঝি ও হাত থেকে পড়ে যাবে না। কেলে বিশেও একে চিনেছে। তাই একটা অপ্রস্তুত হাসি হেসে ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে সে। বিশে তার বাঁহাত দিয়ে ওর সাঙ্গপাঙ্গদের নিষেধ করছে। আর মুখে শুধু বলছে, দাদা

আপনি ভুল করছেন। আপনাকে আমি মারতে আসিনি। আপনাকে তো আমরা চিনি। নামকরা লেখক আপনি। ছিঃ। আপনি আমাদের এত ছোটোলোক ভাবছেন?

ছুরির সঙ্গে সঙ্গে আমিও বেরিয়ে এসেছি অন্ধকারে, এখনও ছুরিটা হাত থেকে খসেনি। জগুদার ছুরি রক্ত পান না করে ক্ষান্ত যায় না। আমি আমার বাঁহাতে একটা খোঁচা দিলাম ফালাটা দিয়ে। ভীষণ যন্ত্রণায় একটা 'আঃ' ধ্বনি বেরিয়ে এল আমার। চাকুটাও যথারীতি ছিটকে গিয়ে পড়ল একটা ড্রেনের ঝাঁঝরির পাশে যেরকম একটা জায়গা থেকে ওকে কুড়িয়ে নিয়েছিলাম বহুকাল পূর্বে।